aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

আমার দেশ
সবার কথা বলে

সাতকাহন

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : অন্ধকার সময়ের বাতিওয়ালা

২০০৭-১১-০৯ : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

১. প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ইংল্যান্ডের লেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফেরেন ১৯৬৮ সালে, যোগ দেন তাঁর পুরনো কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে। ওই বছর আমিও ভর্তি হই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রথমবর্ষ সম্মান শ্রেণীতে। প্রথমবর্ষে তিনি আমাদের না পড়ালেও দ্বিতীয়বর্ষ থেকেই তাঁকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি। আমাদের সৌভাগ্য যে বাংলাদেশের ইতিহাসের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেলেও তিনি কখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিযুক্ত হননি। শিক্ষকতাকেই জীবনের একমাত্র কর্ম-উদ্দেশ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন পেশাজীবনের শুরুতেই, বিদেশ কখনো তাঁকে প্ররোচিত করেনি এবং ঢাকায় তাঁর শেকড় প্রোথিত ছিল বলে দেশের অন্য কোথাও যাননি। এই এতগুলো বছর তিনি শিক্ষকতা করে গেছেন, নিরলস চর্চা করে গেছেন মননশীল সাহিত্যের—মাঝে-মধ্যে স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর অপূর্ব সৃষ্টিশীলতার—ছোট গল্প, নাটক, অনুবাদ এসব নানা ক্ষেত্রে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সব আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন তিনি; তাঁর লেখালেখি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত কিছু গুরুত্বশীল পরিসরে সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে প্রবল সমর্থন জানিয়ে গেছেন গণমুখী সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে; কৃষক-শ্রমিক এবং নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল আন্দোলনকে। পত্রিকায় কলাম লিখেছেন নিয়মিত; রাজনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাদিক খুঁটিয়ে দেখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন—কখনো বাস্তবতা, কখনো তত্ত্বের আলোকে; ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং এর নানাবিধ প্রকাশকে তদন্ত করেছেন; তাঁর মার্ক্সবাদী বীক্ষণের নিরিখে চলমান ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। লেখক সংঘের সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন, সাহিত্য পত্রিকা এবং একাডেমিক জার্নাল সম্পাদনা করেছেন। এবং একজন শিক্ষক, সমাজ বিশ্লেষক এবং সাহিত্য সম্পাদকের জন্য যা জরুরি—অন্যকে অনুপ্রাণিত করা—তা নিরন্তর করে গেছেন। তাঁর কাছে যারা শ্রেণীকক্ষে পাঠ নিয়েছেন, তারা জীবনেরও পাঠ গ্রহণ করেছেন একই সঙ্গে; যাদের জন্য তিনি তাঁর বিশ্লেষী কলম ধরেছেন, তাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করেছেন। তাদের জেগে ওঠার জন্য অন্তর থেকে ডাক দিয়েছেন। তরুণ পাঠককে লেখক হতে এবং তরুণ লেখককে অভিজ্ঞতা এবং আস্থা অর্জনে সর্বাঙ্গীণ সাহায্য করেছেন। যারা তাঁর সাহচর্যে এসেছেন, তারা লাভবান হয়েছেন, যারা তাঁর চিন্তাকে পড়তে পেরেছেন, তাদের সামনে জ্ঞানের অনেক পথ খুলে গেছে; আত্মদর্শন এবং জগৎদর্শনের সূত্রগুলো উন্মোচিত হয়েছে। আমাদের আরো সৌভাগ্য, স্বাভাবিক অবসরে যাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আমন্ত্রণে তিনি আরো কিছুদিন অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন ২০০৭ সালের অন্তিমে এসে দেখতে পাচ্ছি, শ্রেণীকক্ষ থেকে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন, শিক্ষার্থীদের জীবন থেকেও, যদিও পুরনো ছাত্রছাত্রী এবং অবশ্যই সহকর্মীদের জন্য তাঁর দরজা এখনও খোলা। এই সুযোগটুকুও কোনো কম প্রাপ্তি নয়। আর নতুন দিগন্ত সম্পাদনার যে দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন, তার মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর উপস্থিতি এখনও সরব। তবে সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে তাঁর কলমের অবিশ্রান্ত পথ চলা। তিনি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখছেন; সাহিত্য, সমাজ ও সমকাল নিয়ে গবেষণা করছেন, ভাবছেন এবং গ্রন্থকারে সেসব নিয়মিত তুলে দিচ্ছেন পাঠকের হাতে। এই সক্রিয়তা, এই নিজের বিশ্বাস ও জীবন দর্শনের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া এবং নিজের কাজগুলো গুছিয়ে অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া—এই পুরো বিষয়টি আদায় করে নেয় আমাদের বিস্ময় এবং
কৃতজ্ঞতা।

১৯৭৪ সালের অক্টোবরে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেই, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ছিলেন বিভাগের চেয়ারম্যান। তাঁর হাত ধরেই আমার শিক্ষক জীবনের শুরু। সেই থেকে দীর্ঘ ৩৩ বছর তাঁকে শিক্ষক পরিচয়ের বাইরেও একজন সহকর্মী হিসেবে পেয়েছি। না, কথাটাতে একটু অহমিকা প্রকাশ পেল—তিনি আমাকে তাঁর এক সহকর্মীর ভূমিকায় পেয়েছেন। তাঁকে আমি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি, সহকর্মী হিসেবে তাঁর সঙ্গ পেয়েছি, সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে কাছে থেকে তাঁকে দেখেছি। মাঝে মধ্যে বিতর্কের একজন অনুরাগী হিসেবেও দেখেছি, এবং তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করে বাংলাদেশ টেলিভিশন বা অন্য কোনো টিভি চ্যানেলে অথবা টিএসসিতে কোনো বিতর্ক অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে দেখে বিস্মিত হয়েছি। দু'একবার ঢাকার বাইরে কোনো শহরের সাংস্কৃতিক বা সাহিত্য অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে গিয়েছি। একবার কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ার লালনের আখড়ায় ইট-সিমেন্টের বিশাল অট্টালিকা তৈরি করে সরকার যখন নির্বোধের মতো আখড়ার মূল চরিত্রটাই নষ্ট করে দিচ্ছিল, তখন এর প্রতিবাদ জানাতে তাঁর নেতৃত্বে অন্য অনেকের মতো আমিও কুষ্টিয়ায় গিয়েছিলাম। লাভ তাতে কিছু হয়নি; প্রভাবশালীরা প্রায় হামলাই করে বসেছিল আমাদের ওপর এবং বিশাল অট্টালিকার নির্মাণও থামানো যায়নি। কিন্তু ওই ভ্রমণে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সংস্কৃতির বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি তাঁর যতটা ক্ষোভ রয়েছে, তার থেকে বেশি রয়েছে করুণা। তিনি যে বিশ্বাসে অবিচল, তা হচ্ছে প্রান্তিক মানুষের শ্রেয়বোধের জাগরণ ও জয়ের। তাঁর দৃষ্টি সেজন্য সামান্য বিষয়ে বা একদিনের ইতিহাসে নিবদ্ধ থাকে না। সেই দৃষ্টি সামগ্রিক, সামূহিক; তা ইতিহাসের পূর্বাপরতা সন্ধান করে এবং সেখানে বর্তমানের বিচার-বিক্ষোভের একটি উপশম খোঁজে। অবশ্য সংস্কৃতির শত্রু এবং ইতিহাসের পাঠকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারকারীদের তিনি করুণা করলেও ক্ষমা করেন না; বরং তাঁর এক নিজস্ব কৌতুক ভঙ্গীতে তাদের এক ক্ষমাহীন আলোয় তুলে ধরেন।

তবে, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে আমি যে জায়গাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি, তা হচ্ছে তাঁর লেখালেখির ভূমিতে। যে বিষয়েই তিনি লিখেছেন, তাঁর নিজস্ব বিচারপন্থায় তার একটি পূর্বাপর বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু অপপ্রয়োগ কখনো করেননি, যেহেতু সেসব তত্ত্বকে নিজের জীবনে তিনি ধারণ করেন। তাঁর কাজের সঙ্গে বিশ্বাসের কোনো দ্বন্দ্ব নেই, দেখা এবং দেখানোর মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। শ্রেণীসংগ্রাম এবং সর্বহারাদের বিজয়ে তাঁর আস্থা কিছুটা তারিখ সম্বলিত মনে হতে পারে। যেহেতু বিগত শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে এসব আদর্শও মূলভূমি থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু হারিয়ে গেলেও ফুরিয়ে যায়নি, বরং নতুন এক প্রণোদনায় মানুষের মনে ভবিষ্যতের জন্য তা শক্তির যোগান দিচ্ছে। সিরাজুল ইসলাম

aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : অন্ধকার সময়ের বাতিওয়ালা

চৌধুরী এই একটি ইতিহাস পাঠকে কোনো সমঝোতার হাতে ছেড়ে দিতে রাজি হননি। যারা দিয়েছেন, তাদের কাছে তাঁর কিছু কিছু চিন্তাকে তারিখ চিহ্নিত মনে হতেই পারে, কিন্তু তাঁর নিজের কাছে এদের গুরুত্ব সমকালীন ঘটনা প্রবাহের নিরিখে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী একাত্তর পেরিয়ে বাহাত্তরে পা রেখেছেন এ বছরের ২৩ জুন। তাঁর জীবন নাতিদীর্ঘ নয়, কিন্তু জীবন থেকেও দীর্ঘ তাঁর কাজ এবং তাঁর অর্জনসমূহ। তাঁকে নিয়ে কিছু লিখতে গেলে এই বিশালতার কাছে এসে থমকে যেতে হয়। তারপরও একজন শিক্ষক, একজন সাহিত্যিক ও লেখক, একজন চিন্তাবিদ, একজন সমাজ-রাজনীতি-রাষ্ট্র-ইতিহাস বিশ্লেষক এবং তত্ত্ববিদ হিসেবে তাঁর একটি মূল্যায়নের প্রচেষ্টা চালানো যায়। কয়েকটি দিক থেকে তাঁর ওপর আলো ফেলে তাঁকে বোঝার চেষ্টা করা যায়। এবং এ রকম একটি মূল্যায়ন যখন করা হয়, দেখা যায়, একজন শিক্ষকের ভূমিকায় তিনি যে চিন্তা-চেতনা ও সক্রিয়তার সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তার একটা বড় প্রভাব পড়েছে তাঁর লেখালেখিতে; আবার তাঁর লেখালেখির অন্তর্গত শৃঙ্খলা, যাকে তত্ত্ব বললে বর্ণনাগত একটা সুবিধা হয়, তা প্রভাবিত করে তাঁর রাজনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র বিশ্লেষণে। সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর সক্রিয়তাও শক্তি অর্জন করে তাঁর চিন্তাশীল, সৃষ্টিশীল এবং তাত্ত্বিক মনোভঙ্গী থেকে। তাছাড়া শিক্ষকতাকে তিনি কখনো রাজনীতি ও সমাজ থেকে আলাদা করে দেখেননি এবং সমকালীন সবচেয়ে নিষ্পাপ ঘটনাকেও তার কালিক ও স্থানিক সংশ্লিষ্টতা থেকে আলাদা করে বিচার করেননি। এজন্য তাঁর চিন্তা-ভাবনার একটি পরম্পরা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। তিনি আধুনিক একটি সময়ে বসেও, বর্তমানের বিক্ষুব্ধ-বিপর্যস্ত-বিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহের কেন্দ্রে থেকেও তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রকাশে সেই বিচ্ছিন্নতা বা ভঙ্গুরতার প্রকাশ ঘটাতে দেননি। বরং বলা যায়, তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রকাশে তিনি ক্লাসিক ধর্মী। এই ক্লাসিক ধর্মিতা প্রকাশের অন্তর্নিহিত একটি শৃঙ্খলার যেমন প্রকাশ; পূর্বাপরতা, পরম্পরতা ও গভীরতা নির্ণয়ের একটি জরুরি পরিচয়ও বটে। এর অর্থ অতীতমুখিনতা নয়, বরং সমুন্নতি, বিশালতা এবং দূর-দর্শনের প্রতি এক ধরনের স্বাভাবিক আগ্রহ। তিনি খণ্ডিত দর্শনে কখনো বিশ্বাসী ছিলেন না, যদিও আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো আবশ্যকভাবেই খণ্ডিত। তাঁর ক্লাসিক ধর্মিতা এক্ষেত্রে তাঁকে সহায়তা দেয়।
২.ব্যক্তি হিসেবে প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কিছুটা আড়াল প্রত্যাশী। আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিজীবন নিয়ে তাঁর আলোচনা হতো না। যদিও তাঁর ব্যক্তিজীবনের কিছু খুঁটিনাটি অনিবার্যভাবে আমাদের জানা হয়ে যেত। তাঁর পারিবারিক জীবনটাও সকলের চোখের আড়ালে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। তাঁর স্ত্রী নাজমা জেসমীন চৌধুরী যদি শুধুই একজন গৃহিণী হতেন, তাহলে হয়তো তিনি এক্ষেত্রে কৃতকার্য হতেন। কিন্তু নাজমা জেসমীন চৌধুরী নিজে ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও গবেষক; শিশুদের নাটক নিয়ে তাঁর আবেগ ছিল প্রকাশ্য। এসব কারণে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে ব্যক্তি হিসেব মূল্যায়ন করার সুযোগ একেবারে অনুপস্থিত নয়। কিন্তু আমি নিজে এই প্রসঙ্গটিতে কখনো উৎসাহ পাইনি, কোনো কৌতূহলও আমার ভেতর তৈরি হয়নি। আমি তাঁর সহকর্মী হওয়ার পর তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি এবং তখন তাঁর অন্তর্গত, হাসিখুশি একটি রূপ দেখেছি। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা স্বাভাবিক করার জন্য তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, তারপরও শিক্ষক হিসেবে যে দূরত্বটুকু ছিল তাঁর সঙ্গে, তা পুরোপুরি মোচন হয়নি। শ্রেণীকক্ষে তিনি একাই বলতেন, আমাদের থেকে কচিৎ-কদাচিৎ কিছু শুনতেন। কিন্তু তাঁর একা বলে যাওয়ার মধ্যে একটা অধিকার ছিল, যা আসত বিষয়ের ওপর তাঁর অসাধারণ দখল থেকে এবং শ্রেণীকক্ষে যেহেতু তাঁর দূরত্বটুকু সত্ত্বেও বা তা নিয়েও তিনি আমাদের স্পর্শ করতেন, অনুপ্রাণিত করতেন, ব্যক্তি মানুষ হিসেবেও তিনি খুব কাছে না এসেও নিজেকে পূর্ণভাবে তুলে ধরা এবং অন্যকে অনুপ্রাণিত করার কাজটুকু সহজে করে নিতেন। এখন এতদিন পর হয়তো তিনি কিছুটা নির্জনতা প্রত্যাশী, তাঁর স্বাস্থ্যও আগের মতো নেই। কিন্তু যখনি কোনো জরুরি ডাক আসে, নীতি বা শ্রেয়বোধ বা বিবেকের বিচারে যার প্রতি সাড়া দেয়াটা উচিত হয়ে দাঁড়ায়, তিনি তাতে যে শুধু সাড়া দেন, তা-ই নয়, বরং অন্যদেরও সংঘবদ্ধ করেন। তখন তাঁকে আবার সক্রিয়তার কেন্দ্রে দেখা যায়। ব্যক্তিগত গণ্ডি থেকে তিনি তখন অনেক মানুষের মাঝখানে চলে আসেন। যারা অনেকদিন থেকে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত একটি সম্পর্কে জড়িয়ে গেছেন, নিয়মিত আসা-যাওয়া বা কথাবার্তা ছিল তাঁর সঙ্গে, তাঁরা তাঁর এই পরিচয়টি নিয়ে লিখবেন। তাঁদের মধ্যে একজন হুমায়ুন আজাদ, গত হয়েছেন। ড. সাইদুর রহমান এবং প্রফেসর আহমদ কামাল হয়তো লিখতে পারেন। অথবা আরো কেউ কেউ। আশা করি তাঁরা লিখবেন।
আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি তাঁর অন্য পরিচয়গুলো তুলে ধরতে। একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি বরাবর একটু উঁচু জায়গাতে সমাসীন, আমার কাছে অনেকের চাইতেও যা উঁচু। তার কারণ তিনি শেক্সপিয়ার, মিল্টন অথবা ডিএইচ লরেন্সের পঠন-পাঠনের পদ্ধতিগুলো, তাদের নানা ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং তাদের পৃথিবীতে অনুসন্ধানী পর্যটক হওয়ার পথগুলো আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যা, শ্রেণীকক্ষে তাঁরই জায়গায় দাঁড়িয়ে একদিন এইসব লেখক কবি-নাট্যকারকে যখন ব্যাখ্যা করতে হয় শিক্ষার্থীদের কাছে, তখন তিনি এক নীরব অনুপ্রেরণার মতো পাশে এসে দাঁড়ান। সাহিত্য তো শুধু নন্দনপাঠ নয়, শিল্পের সুষম এবং সুরভিত প্রকাশ নয়, হাতির দাঁতে তৈরি মিনারে চড়ে বসা নয়; সাহিত্য জীবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকেই তো উঠে আসে; সেখানেই তার হয়ে ওঠার নানা সূত্র নিহিত থাকে, সেখানেই তার বৈধতা। এই দর্শনটুকু খুব মৌলিক নয়; চর্যাপদ-এর কবি থেকে নিয়ে সৈয়দ শামসুল হক পর্যন্ত এমনটিই দেখা গেছে, এবং বিশ্বের অন্যসব সাহিত্যেও। কিন্তু এই দর্শন থেকে যখন শুরু হয় পঠন ও অনুসন্ধানের প্রস্তুতি, সাহিত্যের অপরাপর দরজাগুলোও পাঠকের জন্য খুলে যায়। কবিতা পড়ানোর সময় তাঁকে মনে হতো নিউ ক্রিটিসিজম-এর অনুরাগী তিনি : কবিতার কলকব্জাগুলো খুঁটিয়ে দেখতেন, ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন, শৈলীচিন্তাকে গুরুত্ব দিতেন—উপমা-উৎপ্রেক্ষা-প্রতীকের অনিবার্যতা এবং বৈচিত্র্য নিয়ে বিশ্লেষী মন্তব্য করতেন, যদিও কবিতার বিষয় চিন্তাকে তিনি খাটো করে দেখতেন না কখনো। কিন্তু উপন্যাসে তিনি সমাজ চিন্তার সূত্রগুলো খুঁজতেন, একটা প্রচ্ছন্ন—কোনো কোনো সময় প্রত্যক্ষ—মার্কসবাদী তত্ত্বের বিস্তার ঘটাতেন তাঁর ব্যাখ্যায়। বাস্তববাদী সাহিত্যে তাঁর আস্থা ছিল, জর্জ লুকাস অথবা লুচিয়েন গোল্ডম্যানের মতো, বিশেষ করে যখন তা সমাজের নানা অসঙ্গতি,

aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

সাতকাহন

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : অন্ধকার সময়ের বাতিওয়ালা

পুঁজির শাসন, শ্রমের শোষণ এবং শ্রেণী বৈষম্যের রূপগুলো তুলে ধরত। সত্তর-আশির দশক থেকে পশ্চিমে যে নব্য ইতিহাসবাদের চর্চা শুরু হয়, যাতে একটি সাহিত্যকর্ম বা টেক্সট-এর পেছনের 'সামাজিক শক্তি'কেই প্রধান একটি বিবেচ্য হিসেবে দেখা হয়, অর্থাৎ ইতিহাস, মানুষ ও সমাজের সঙ্গে একটি টেক্সটের সংযুক্তি ও মিথস্ক্রিয়াকে, তার সাক্ষাৎ আমরা অনেকবার পেয়েছি তাঁর উপন্যাস-ব্যাখ্যায়। কিন্তু শুধু সমাজ বাস্তবতা নয়, উপন্যাসের চরিত্রের মনোজগতের গভীরেও তিনি দৃষ্টি দিতেন; মানব-মানবী এবং ব্যক্তি ও সমাজের আন্তঃসম্পর্কের সূত্রগুলোকেও বোঝার চেষ্টা করতেন, তাদের ব্যাখ্যা দিতেন। যে কোনো সাহিত্যকর্মের, বিশেষ করে উপন্যাস ও নাটকের, সঙ্গে ইতিহাসের সরল-জটিল সম্পর্কগুলোকেও তিনি তদন্ত করতেন। উপনিবেশবাদের ইতিহাস ও এর নানা প্রকাশ ও বিবর্তন ছিল তাঁর অনুসন্ধানের প্রিয় একটি বিষয়। তিনি লেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পিএইচডি অভিসন্দর্ভ লেখেন, তার বিষয়বস্তু ছিল লরেন্স ও ইএম ফর্স্টার এবং জোসেফ কনরাডের উপন্যাসে অশুভের বিভিন্ন প্রকাশ। এই তিন উপন্যাসিককেই তিনি পড়িয়েছেন আমাদের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে এবং আমাদের সময়ে পাঠক্রমে শুধু উপন্যাসিকের নাম থাকত, কোনো উপন্যাসের নয়, এবং একজন উপন্যাসিকের অনেকগুলো উপন্যাস আমাদের পড়তে হতো— এখন যে রকম একটি, বড়জোর দুটি উপন্যাস পাঠ্য থাকে, তেমন নয়।

এর ফলে একজন ঔপন্যাসিকের একটা পূর্বাপর পরিচয় আমাদের জানা হয়ে যেত। আমরা বুঝেছিলাম যে, অশুভের বিষয়টা শুধু পোশাকি নৈতিকতার নয়, বা কোনো অধিবিদ্যাধর্মী বিমূর্ত চিন্তার বিচার্য নয়; অশুভের উৎপত্তি মানুষের জাগতিক নানা কর্মকাণ্ড থেকেও, যার একটি বড় প্রকাশ উপনিবেশবাদে। এডওয়ার্ড সাইদের প্রাচ্যবাদ-তত্ত্ব (যা তাঁর ওরিয়েন্টালিজম গ্রন্থে বর্ণিত আছে) উপনিবেশবাদকে নতুন একটি আলোকে পড়তে আমাদের সাহায্য করেছে, যেখানে পশ্চিম তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও প্রয়োজন থেকে পুবকে পড়ে, এবং পুবের ওপর কিছু পূর্বনির্ধারিত চিন্তা-ভাবনা চাপিয়ে দেয়। একই সঙ্গে গৌরী বিশ্বনাথন তাঁর মাস্কস্ অফ কঙ্কেস্ট গ্রন্থে আমাদের জানান, ভারতে ইংরেজি ভাষা (ও সাহিত্য) চালু করার পেছনে ইংরেজের কী সুদূরপ্রসারী সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা ছিল। উত্তর-উপনিবেশী সাহিত্য ও সমাজতত্ত্বে উপনিবেশবাদের অনেক প্রচ্ছন্ন প্রকাশ্য চিন্তা, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় এবং মতলবের অসংখ্য ব্যাখ্যা আমরা পাই, যা ইউরোপের এই অতি-পুরনো উদ্যোগের মূল চরিত্রটি বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, স্যারের ক্লাসে এসব বিষয় সম্পর্কে বেশকিছু ধারণা আমাদের অনেক আগেই তৈরি হয়ে গেছে। তিনি উত্তর-উপনিবেশী কোনো তত্ত্ব আমাদের শোনাতেন না, এখনো উপনিবেশ বা সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে তিনি যখন লেখেন, তখন তাকে উত্তর-উপনিবেশী তত্ত্বের কোনো ঘরানাতে ফেলা যায় না, কিন্তু উপনিবেশবাদকে বোঝার জন্য তিনি অনেক চিন্তা আমাদের উপহার দেন। নিম্নবর্গীয়ের ইতিহাস যে এলিট শ্রেণী রুদ্ধ করে রাখে, এর আখ্যানটা নিজেদের মতো তৈরি করে নেয়, এই চিন্তাটিও তার ক্লাসে তিনি আমাদের মধ্যে জাগিয়েছেন। আগেই বলেছি, তিনি কোনো জনগোষ্ঠীর খণ্ডিত ইতিহাসে বিশ্বাস করেন না। যদি একটি বিপ্লব হয় কোথাও, তিনি বিপ্লবের পেছনের ইতিহাসটি পড়বেন, সামনের ইতিহাসটিও পড়বেন এবং মানুষ, সময়, শ্রেণী, অর্থনীতি ইত্যাদি এসব বিষয়ের সঙ্গে এর সংযোগগুলোকে খুঁটিয়ে দেখবেন। ফলে ফস্টারের এ্যা প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া যখন তিনি পড়াতেন, উপনিবেশের প্রশ্নটিকে তিনি শুধু কুড়ি শতকের প্রথম দুই-তিন দশক, অথবা হিন্দু বা মুসলমানের সমাজগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অথবা উপনিবেশী ইংরেজদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতেন না। তার ব্যাখ্যায় আরো পুরনো ভারত, আরো অনেক দ্বন্দ্ব, দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের আরো অনেক কারণ উঠে আসত। তার সব ব্যাখ্যার সঙ্গে যে সবাই ঐকমত্য পোষণ করবে তা নয়, বিশেষ করে একুশ শতকের বাস্তবতাটা এতটাই ভিন্ন গত তিরিশ বছরের আগের বৈশ্বিক বাস্তবতার চাইতেও যে, পুরনো অনেক চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ ও সত্যের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও যুক্ত হচ্ছে অভাবনীয় অনেক মাত্রার; কিন্তু এই দ্বিমত পোষণ করা, এই ব্যাখ্যার পাল্টা নতুন ব্যাখ্যা তৈরি করা—এসব বিষয়ে তার উৎসাহটাই ছিল বেশি। সাহিত্য সম্পর্কে তার মৌলিক কিছু চিন্তা-ভাবনার যখন তিনি প্রতিফলন ঘটাতেন, শিক্ষার্থীদের জন্য নিজস্ব ব্যাখ্যার ভূমিটাও তিনি তৈরি করে দিতেন। কিন্তু তার মৌলিক চিন্তা-ভাবনাগুলো উঠে আসত নিবিড় পঠন-পাঠন ও পর্যবেক্ষণের অঞ্চল থেকে।

একইভাবে, সাহিত্যে নারী-ভাবনার প্রতিষ্ঠিত প্যারাডাইসগুলোকে শ্রেণীকক্ষেই তিনি প্রশ্ন করতেন, ব্যাখ্যা করতেন শেক্সপিয়র অথবা ডিএইচ লরেন্সে নারীর অবস্থানের। একটি নারীচরিত্রের পেছনে পুরুষের কী উপস্থিতি, তার রূপায়ণে পুরুষ-চিন্তার কী প্রভাব, এসব নিয়ে তিনি খোলামেলা চিন্তা করতেন। যৌনতার বিষয়টিও উঠে আসত তার ব্যাখ্যায়—এমনকি সমকামিতারও—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের তিনি বাজাতেন তার সমাজ ও শ্রেণী চিন্তার বিপরীতেই। ফলে, পরিচিত একটি বর্ণনার ওপর পড়ত ভিন্ন কিছু আলো, একেবারে অপরিচয়ের না হলেও এবং সাহিত্যপাঠ একটি আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়াত।

সাহিত্যপাঠে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে স্যার আমাদের দৃষ্টি কখনো সরে যেতে দেননি এবং তা হচ্ছে লেখকের দায়বদ্ধতা এবং একই সঙ্গে পাঠকের দায়বদ্ধতা। লেখকের কাজ যে শুধু কল্পনার পৃথিবীতে ভ্রমণ করা নয়, অথবা বাস্তবের জগতের কিছু ছবি তুলে ধরা নয়, বরং জীবনকে আরো সুন্দর করার মানুষকে আরো উচ্চতায় উঠতে সাহায্য করার, অথবা আদর্শ ও নীতিচিন্তাকে সহজ বোধের মধ্যে নিয়ে আসার একটা দায়িত্বও তার আছে, এ বিষয়টি তিনি নানাভাবে আমাদের বলতেন। তবে যেসব লেখক তাদের সাহিত্যকর্মে সুন্দর বা জীবনের নান্দনিকতার পাঠটাকে প্রধান করতে চান, তাদের প্রতিও মনোযোগী দৃষ্টি ছিল তার। সে রকম লেখকও জীবনকে অনেককিছু দিয়েছেন, সাহিত্যকে একটা আলাদা মহিমা দিয়েছেন। তবে যে সাহিত্যে জীবনের সত্যকে অস্বীকার করা হয় তার প্রতি কোনো সমীহ তার ছিল না। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সাহিত্য-রুচিতে ক্লাসিক চেতনার সঙ্গে প্রতিবাদী রোমান্টিক চেতনা; ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে গণমানুষের জীবনের প্রতি ভালোবাসা এবং সমাজকে সামনে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয়ের প্রতিফলন ছিল। এখনো, উত্তরাধুনিকতার মতো অনেক নতুন সাহিত্যতত্ত্ব ও দর্শনের আত্মপ্রকাশের পরও এর তেমন পরিবর্তন হয়নি। একই সঙ্গে তার শৈলীচিন্তাকে শিল্পের অখণ্ডতার পাশাপাশি নিরীক্ষাধর্মী নানান উদ্যোগের প্রতি সমর্থন রয়েছে।

aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : অন্ধকার সময়ের বাতিওয়ালা

আধুনিকবাদকে তিনি শুধু বিমূর্তায়ন বা চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতি অথবা পরাবাস্তববাদ বা উদ্ভটবাদের মতো শিল্পধারণার প্রকাশ হিসেবে না দেখে ইতিহাসের একটি নতুন পাঠ এবং সমাজবিবর্তনের ও চিন্তা-জ্ঞানের জগতে একটি নতুন আন্দোলনের যোগফল হিসেবে দেখতেন। এজন্য সমাজের পরিবর্তে ব্যক্তিকে আধুনিকতার উপজীব্য হিসেবে মেনে নিলেও সমাজের ও ইতিহাসের ভূমিকাটি তিনি কমিয়ে দেখতে রাজি ছিলেন না। টি এস এলিয়টের পোড়াজমি অথবা জে আলফ্রেড প্রুফক যখন আধুনিকতার কিছু প্রকাশ ও আধুনিক মানুষকে একটি প্রতিনিধিত্বকারী আলোকে দেখা হচ্ছে, তখন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা, পারস্যবোধ এবং বিচ্ছিন্নতা ও স্নায়ুবৈকল্যের পেছনে অর্থনীতি, ইতিহাস ও রাজনীতির ক্রিয়াশীল উপস্থিতিকে খুঁটিয়ে দেখেছেন। এজন্যই সম্ভবত, আধুনিকবাদের পশ্চিমা প্রকাশের নানা অসঙ্গতি, দুর্বলতা এবং অতিরঞ্জনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে যখন উত্তরাধুনিকতার আবির্ভাব হলো, নতুন এই দর্শন (অথবা জীবনধারা অথবা প্রবণতা অথবা প্রতি-আখ্যান) তাকে আগ্রহী করতে পারল না। যেখানে মানুষের মৌলিক সংগ্রামটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, যেখানে আধুনিকতার সূত্রগুলোই তো অনেকটা অপ্রকাশ্য। উত্তরাধুনিকতার বিলাসিতা এখানে, ইউরোপের মতো, নিশ্চয় সম্ভব, অথবা উচিত নয়।

৩.উনিশশ' সত্তরের দিকে যখন প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পরিক্রমা নামে একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক, তার কাছে একটি কবিতা নিয়ে আমি হাজির হয়েছিলাম এক অপরাহ্ণে। তিনি তার অফিসকক্ষে বসে কাজ করতেন, পড়তেন। জানালা ঘেঁষে টেবিল ছিল, জানালা দিয়ে আসা সমৃদ্ধ আলোয় তিনি বই খুলে বসতেন। জানালার বিপরীতে যে ব্যালকনি ছিল, তা ধরে হাঁটলে দেখা যেত, নিবিষ্ট মনে তিনি পড়ছেন। তার ঘরভর্তি বই ছিল; টেবিলেও ছড়ানো থাকত বই। আমি কবিতাটি দিলে তিনি একটুখানি দেখে বলেছিলেন, ঠিক আছে, রেখে যাও। পরিক্রমা-র পরের সংখ্যাতে সেটি ছাপা হয়েছিল। সে সময় পরিক্রমা-য় কিছু ছাপা হওয়াটা ছিল ভাগ্যের ব্যাপার। এটি তাৎক্ষণিক সংবাদের মর্যাদা পেত, যেমন পেত সমকাল অথবা কণ্ঠস্বর-এ কিছু ছাপা হলে। তার হাত দিয়ে আমার কবিতা ছাপা হলে কবির একটি সনদ আমার জুটে যাওয়ার কথা, জুটে গিয়েও ছিল। কিন্তু কবি হওয়ার প্রবল কোনো ইচ্ছা না থাকায় কবিতা লেখায় ইস্তফা দিই। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এই সিদ্ধান্ত শুনে কিছুটা অবাক হয়েছিলেন; কিন্তু তা নিয়ে কোনো কথা না বলে আমাকে প্রবন্ধ লিখতে বলেছিলেন। প্রবন্ধ লেখাটা আমার কাছে আনন্দজনক একটি অভিজ্ঞতা ছিল এবং এর পেছনে তার ভূমিকাটা ছিল পরোক্ষ, যেহেতু, ততদিনে তার প্রায় প্রতিটি লেখাই পড়া হয়ে গিয়েছিল এবং মননশীল লেখার বিষয়বস্তু কী হতে পারে, ভাষার ভূমিকা এবং চরিত্রটা সেখানে কী হওয়া উচিত, অথবা যুক্তির পূর্বাপরতা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের উপস্থাপনা কীভাবে করা যায়—এসব ব্যাপারে একটা তালিম তার লেখা থেকে পাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য আমার ক্ষেত্রে প্রবন্ধের আরেক সূত্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যেমন ছিলেন এলিয়ট এবং পঞ্চাশ-ষাটের ইউরোপীয় সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সাহিত্য-সমালোচকরা, যাদের অনেকের স্থান ছিল আমাদের পাঠ্যক্রমে।

পরিক্রমা-র পর আমার যে লেখা প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ছাপিয়েছিলেন, তা ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল-এ। ইংরেজি ভাষার এই জার্নালে একাডেমিক লেখাই ছাপা হতো, তবে বুক রিভিউও ছাপা হতো। বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ আমার এই জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল, কিছু বুক রিভিউও। সেই সময় হাতে কম্পোজ করে নিউজপ্রিন্ট কাগজে প্রুফ পাঠানো হতো। নিজের লেখার বাইরেও আমাকে মাঝে মাঝে অন্যের লেখার প্রুফ দেখতে হতো। আমি অবাক হয়ে দেখতাম, ছাপাখানার বিষয়গুলো তার অজানা ছিল না, যেমন ছিল না গেটআপ ও ডিজাইনের বিষয়গুলি। প্রকাশনার সব খুঁটিনাটির দিকে তার নজর থাকায় জার্নালটির একটি উঁচু মান দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

৪. প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রথম কোন বইটি আমি পড়েছিলাম, এখন মনে নেই, হয়তো অন্বেষণ, যেটি ১৯৬৪ সালে বেরিয়েছিল; কিন্তু আমার মনে আছে তার কোনো বই বেরুলে আমার বাবার জন্য তা কিনতে হতো।

তিনি বাবার প্রিয় লেখক ছিলেন এবং তিনিই আমাকে জানাতেন, বিষয়গুণ ও শিল্পগুণে তার লেখাগুলো কতটা মনোগ্রাহী ছিল। ডিএইচ লরেন্স বাবার প্রিয় লেখক ছিলেন এবং প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীরও। আমাদের বাড়ির বইয়ের আলমারিতে লেডি চাটার্লিজ লাভার ছিল, যদিও স্কুল-কলেজে পড়ার সময় এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষে বইটি পড়ার আগ্রহ জাগে এবং অবাক কাণ্ড বাবা খুব উদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার অনাপত্তি জানিয়ে দেন। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পাঠকের দায়বদ্ধতার ওপর একটি লেখা অথবা মন্তব্য করেছিলেন, যা বাবার চোখে পড়েছিল। সেই লেখাটিও তিনি আমার হাতে ধরিয়ে দেন। অবশ্য উপন্যাসটি পড়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অভিজ্ঞতা এবং এর ক্ষেত্রে স্যারের কথাগুলো যে ঠিক প্রযোজ্য নয়, তা-ও বাবা নিশ্চয় জানতেন। কিন্তু দায়বদ্ধতার বিষয়টি ভবিষ্যতে যে আমার কাজে লাগবে, সেটি মেনেই এই দায়িত্ব অর্পণ। বাবা একটা কথা বলতেন যে, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যে কোনো বিষয়কে তার বর্ণনার গুণে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে জানেন। বিষয়টি যে কোনো অতিরঞ্জন ছিল না, স্যারের লেখা পড়তে শুরু করার পর আরো নির্দিষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি। তার লেখার তিনটি বড় গুণ এবং সেগুলো হচ্ছে, ভাষার স্বচ্ছতা, চিন্তার দার্ঢ্য এবং বিষয়ের অনিবার্যতা। যে বিষয় তিনি বেছে নেন, সেটি অনিবার্য এবং নির্বিকল্প হয়ে ওঠে।

তার বিষয়বস্তুর একটি তালিকা করলে দেখা যাবে, ঘুরেফিরে তিনি স্থিত হচ্ছেন তার প্রিয় কিছু চিন্তার মধ্যে, যেমন মানুষ, সমাজ, পরিবেশ, সময় প্রান্তিক ও শোষিত জনগোষ্ঠী, রাষ্ট্র, ইতিহাস, বাঙালি, গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-রাজনীতি। এর দিকে আছে ক্রিয়াশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা; মৌলবাদ ও ধর্মব্যবসা; বৃত্ত, বৃত্তাবদ্ধতা ও বৃত্তের বাইরে যাবার প্রত্যয়; শ্রেণী সময় ও গোষ্ঠী; উৎপাদন-শোষণ-মধ্যস্বত্বভোগ; সাম্য-স্বাধীনতা-সৌভ্রাতৃত্ব; সংস্কৃতি, জনজীবন এবং জীবনের মান-অপমান; স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা; নারী, পুরুষ ও পিতৃতান্ত্রিকতা; ভাষা ও ভাষার শত্রু-মিত্র; সমাজকাঠামোর দুর্বলতা ও এর পরিবর্তনের অনিবার্যতা; বিপ্লব-প্রতিবিপ্লব; নায়ক ও খলনায়ক; পুঁজিবাদের কলুষ ও তার বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই, বিশ্বায়ন এবং স্থানীয় সংস্কৃতি ও সমাজে তা থেকে উদ্ভূত সংকট—এরকম আরো কিছু চিন্তা। এসব চিন্তা দুভাবে প্রকাশিত; এক. তাদের নিজস্ব শক্তি (ইতি ও নেতি উভয় দৃষ্টিতে) প্রয়োজন এবং অনিবার্যতা নিয়ে এবং একটি দ্বিত্বতা বা বাইনারিতে, বিপরীত চিন্তার সঙ্গে গ্রন্থিভুক্ত হয়ে। বৃত্ত তার

aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

সাতকাহন

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : অন্ধকার সময়ের বাতিওয়ালা

একটি প্রিয় মেটাফর—উৎপ্রেক্ষা। বৃত্ত অনেককিছুর প্রতিভূ ব্যক্তির সংকীর্ণতা, চিন্তার সীমাবদ্ধতা, সমাজের প্রচলের ঋজুতা অথবা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের আঁকা চকখড়ির অনতিক্রম্য গোলক। বৃত্তের আরো ব্যাখ্যা আছে এবং কোনো কোনো লেখায় এটি যান্ত্রিকতার উচ্ছ্বাসহীন প্রকাশ অথবা নিষ্ফল কোনো উদ্যোগেরও পরিচায়ক। কিন্তু বৃত্ত প্রায়শই বৃত্ত-ভেঙে বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনার সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত হয়ে দেখা যায়। বৃত্তের উচ্চারণ মাত্র বৃত্তটি ভাঙার তোড়জোড় শুরু হয়, বৃত্তটি ভেঙে বাইরে পা রাখে পাঠক। কিছু বাইনারি প্রথা (বা আদর্শ)-সিদ্ধ যেমন ভিত্তি-উপরিকাঠামো, যার ব্যবহারে মার্ক্সবাদী বীক্ষণের প্রভাবটি অনস্বীকার্য। আবার কিছু কিছু বাইনারি আপাতদৃষ্টিতে চোখে পড়ে না, তার জন্য অনেকটা গভীরে যেতে হয়। রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপন্যাস নিয়ে লিখেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঘরে বাইরে নিয়ে লিখেছেন, শেষের কবিতা নিয়ে লিখেছেন। ঘরে বাইরের বাইনারিটি স্বতঃসিদ্ধ হলেও কুমুর বন্ধন ও বন্ধনমুক্তি অথবা শেষ ও শুরুর দার্শনিক দ্বৈততা অতটা প্রকাশ্য নয়। কিন্তু এগুলি নিয়ে ভাবতে বসলে সমাজের পরতে পরতে লুকানো আরো অসংখ্য বাইনারির সঙ্গে মিলিয়ে তাদের পরীক্ষা করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত একটা ধারণা হয় যে, সমাজ যদি মৌলিকভাবে না বদলায়, এসবের পরিবর্তন না হওয়াটাই স্বাভাবিক। একজন নারীর অবস্থানকে সূচিত করে পুরুষের দৃষ্টি : কিন্তু প্রথাগত ও অভ্যস্ত পাঠে তা সহজে ধরা পড়ে না। কিন্তু যখন লেখক প্রেক্ষিত এবং পারিপার্শ্বিতার পরিব্যাপ্ত বিচারটি শুরু করেন, তখনই শুধু তারা বিশেষ দ্যোতনা নিয়ে প্রতিভাত হয় এবং পাঠকের কাছে বিচারের প্রক্রিয়াটি তার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে নেয়ার আহ্বানটি আসে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর কাছে কয়েকটি বিষয় যেমন প্রিয়, কয়েকটি তেমনি অপ্রিয়; কিছু বিষয় ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা অথবা প্রণোদনার, কিছু বিষয় ব্যক্তিগত হলেও বৃহত্তর 'পাবলিক ডিসকোর্সের' কাঠামোতে স্থাপিত। আরো কিছু বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে অনেকেই লিখেছেন—যেমন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা অথবা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা; কিন্তু স্যারের ব্যাখ্যায় একটা নিজস্বতা ও মৌলিক মাত্রা সবসময় দৃশ্যমান হয়। তার কারণ আগেই নির্দেশ করা হয়েছে—তার অসাধারণ ইতিহাসজ্ঞান এবং সমাজ ও ব্যক্তিদর্শন। শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যেসব লেখালেখি প্রকাশিত হয় আমাদের দেশে, তাতে শুধু বর্তমানের প্রেক্ষিতটি উপস্থিত এবং কিছু বস্তুগত এবং গুণগত সূচকের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগুলি উপস্থাপিত হয়। ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়; কিন্তু এই হচ্ছে সাধারণ চিত্র। কিন্তু সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তার আলোচনাকে ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, সমাজের নানা বৈষম্য এবং শিক্ষার 'উপনেবেশীকরণ'-এর মতো অনস্বীকার্য প্রসঙ্গগুলিতে নিয়ে যান, যুক্তি ও তর্কের একটি পলেমিকে তিনি তার বক্তব্যকে সাজান এবং প্রায়শই এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পাঠককে সাহায্য করেন যে, যদি সমাজের ভিত্তিটা না বদলায়, উপরিকাঠামোতে কোনো পরিবর্তন আসলে তা হবে সাময়িক, অথবা এর সুফল হবে স্বল্পস্থায়ী। শিক্ষা অথবা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুঁজির শাসনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ দেশে একরকমের হয়, অথবা এদের কার্যকারিতা হয় একরকমের; আর যে দেশে শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে, খেটে-খাওয়া মানুষের পক্ষে, পুঁজির বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ও সমাজের অবস্থান, সে দেশে হয় ভিন্ন রকম। ভাষা নিয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখালেখিতেও একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত। ভাষা নিয়ে তার আবেগ আছে এবং তা তিনি গোপন করেন না। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন না যে, শুধু ব্যক্তির সিদ্ধান্তে ভাষা প্রতিষ্ঠা পায়। বাংলা ভাষা কেন অবহেলিত বাংলাদেশে, এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব ও আকর্ষণ, বিশ্বায়নের প্রভাব ইত্যাদি উল্লেখ করলেও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের জানান, বাংলা ভাষার বিকাশ অথবা ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে পুঁজির শাসনের জন্য। এই পুঁজির চরিত্রটি আন্তর্জাতিক—এর বিকাশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসমাজ ও শক্তিসমূহের সঙ্গে দেশীয় পুঁজিশ্রেণীটি জড়িত এবং দেশীয় পুঁজিশ্রেণীটি আবশ্যিকভাবেই ইংরেজির প্রতি অনুরক্ত এবং ইংরেজির ওপর নির্ভরশীল। অথচ ইংরেজি চর্চায়ও যে সঠিকতা আছে তা নয়। তিনি ইংরেজির বিরুদ্ধে নন, কিন্তু মাতৃভাষার স্থান ইংরেজির দখলে চলে যাওয়ার প্রবল বিরোধী এবং ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বৈশ্বিক পুঁজির সংযোগটি না জেনে এর অধীনস্থ হওয়ার প্রবল বিরোধী। বাংলাদেশে ভাষা চিন্তায় এই প্রেক্ষিতটির যোগান দীর্ঘদিন থেকেই তিনি দিয়ে এসেছেন, কিন্তু এ নিয়ে নীতিপ্রণেতা থেকে ভাষা ব্যবহারকারী—কেউ তেমন চিন্তাভাবনা করছেন, তা মনে হয় না।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখালেখির আরেকটি পরিচয় হচ্ছে এক একটি বৈশ্বিক মাত্রা। ওই 'বৈশ্বিক' কথাটি সম্প্রতি প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে, যার জন্য এর একটি ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তার ক্ষেত্রে যে অর্থে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে নেতিবাচক দিকগুলি—যেমন উপনিবেশবাদ বা পুঁজির বিষয়টি নেই, আছে জ্ঞান ও চিন্তা এবং সাংস্কৃতিক সক্রিয়তার একটি আন্তর্জাতিক প্রকাশ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বৈশ্বিক শব্দটির চাইতে আন্তর্জাতিক শব্দটি বেশি পছন্দ করেন, কারণ এর অভিধা এবং অভিঘাত পরিচ্ছন্ন। তিনি শুধু ইংরেজি বা বিশ্বসাহিত্যের বিশিষ্ট পাঠক হওয়ার কারণে যে আন্তর্জাতিক একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পেরেছেন তা নয়, বরং দেশীয় প্রেক্ষিতের পেছনে কার্যকর ইতিহাস ও রাজনীতির অবস্থানগুলি শনাক্ত করতে গিয়ে স্থানীয় ইতিহাসের পেছনভূমিটি পড়তে গিয়ে এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও সময়ের সম্পর্কগুলি পুনর্নিধারণ করতে গিয়েই বিস্তৃত ওই ভূমিটিকে তিনি চিহ্নিত করেন, যাকে বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক বলে আমরা অভিহিত করি। অর্থাৎ তার চিন্তায় বৈশ্বিক কথাটি অবধারিতভাবে একটি বাইনারিতে স্থানীয়-র সঙ্গে যুক্ত হয়। তিনি নিজস্ব সংস্কৃতিতে যে শক্তি খুঁজে পান, তা সর্বদা তাকে উন্মুক্ত হওয়ার আশংকা থেকে রক্ষা করবে। কাজেই এমন একজন মানুষ হিসেবেই তিনি বিশ্বকে দেখেন, যার মূল গভীরভাবে বাংলাদেশের মাটিতে প্রোথিত।

এই বৈশ্বিক অবস্থানের দুটি সুফল তার লেখায় আমরা পাই। এক. বিশ্বের চিন্তাগত এবং সংস্কৃতি ও সাহিত্যগত সব মানবিক প্রকাশ বা আন্দোলনের সঙ্গে তার সংযুক্তি এবং তার বিষয় ও শৈলীগত প্রকাশে একটি দীর্ঘ প্রেক্ষিতের উপস্থিতি। মার্ক্সবাদের উদ্ভব পশ্চিমেই, যেমন পুঁজির বা ধনতন্ত্রের বিকাশও। মার্ক্সবাদের মূল চিন্তাগুলির সূত্র পশ্চিমের অভিজ্ঞতাবহ, এর পরিধিতে সর্বজনীন প্রেক্ষাপটটি সহজেই সংযুক্ত হতে পারে। বিশ্বসাহিত্য পাঠের পাশাপাশি বিশ্বের জন্য সর্বজনীন একটি চিন্তা ও কর্ম-আন্দোলনের দীর্ঘ পটভূমিটি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে তার দৃষ্টি অনেক দূরে নিক্ষেপ করার সুযোগ করে দিয়েছে। আমার ধারণা, বিশ্বের বিভিন্ন চিন্তা আন্দোলন থেকে তিনি অনেক পাঠ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সেগুলোকে সবসময় নিজের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেই কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। শেক্সপিয়রের নারীচরিত্রগুলি নিয়ে তিনি একটি মনোগ্রাহী লেখা

aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

সাতকাহন

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : অন্ধকার সময়ের বাতিওয়ালা

লিখেছেন, কিন্তু সেখানে ওই নারীদের পেছনে উঁকি মারে রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্রের নারীরা। এই প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন সংযোগে নারীর ইতিহাসটি আর একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে আবদ্ধ থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপিয়রের ডেসডিমনা, মিরান্ডা ও কালিদাসের শকুন্তলা চরিত্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু সেটি ছিল একটি নিতান্তই সরল পাঠ, তাতে ইতিহাস বা সমাজবাস্তবতার কোনো প্রসঙ্গই আসেনি। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এ ধরনের তুলনায় বিশ্বাস করেন না। তিনি বরং পাঠকের ইতিহাস সচেতনতা এবং নানা পুরনো ও সমকালীন ভাবাদর্শ এবং সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে জানাশোনার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন, কারণ এর অভাবে যে কোনো পাঠই সরল পাঠ হতে বাধ্য। তিনি যখন শেক্সপিয়রের নায়িকাদের নিয়ে আলোচনা করেন, তখন ওই স্বতঃসিদ্ধতার বিষয়টি সামনে চলে আসে। তিনি না উল্লেখ করলেও অনেকগুলি বিচার-সূচক উক্ত হয়, উহ্য থাকে না।
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর রচনা পদ্ধতির সঙ্গে ফ্রান্সিস বেকনের পদ্ধতির একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বেকনের গদ্যের অনুরাগী পাঠক, যদিও সহজ অর্থে থাকে অনুসরণ করা, তা তিনি করেননি। বেকনের এপ্রিগ্রামাটিক শৈলীটি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীও—অর্থাৎ যে বক্তব্য বা ব্যাখ্যা তিনি দেন তার বিষয়ের যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান, তা সংক্ষেপে, সার-সমৃদ্ধভাবে এবং একই সঙ্গে শিক্ষিত একটি রসে ভিজিয়ে পরিবেশন করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলো প্রবচনের মতো শোনায়। তার লেখাতে একটি প্রচ্ছন্ন রসবোধ কাজ করে, যা আয়রনি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্রূপে সূক্ষ্মরূপ ধরে হাজির হয়। অবশ্য রস শব্দটি প্রথাগত অর্থে তার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না—সে রকম রসসমৃদ্ধ লেখা তার নেই এবং তার বিষয়ের সঙ্গেও তা সম্পর্কিত নয়। রস এক্ষেত্রে একটি বস্তুনিষ্ঠ মাত্রা থেকে, ধৈর্যের সঙ্গে, ভিন্ন ও বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে স্থিতধী সংলাপ চালিয়ে কিছু সহজে বোধগম্য চিন্তা ছেঁকে আনার কার্যকর একটি মাধ্যম। এটি বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু অজটিল।
সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনায় সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বৈচিত্র্য সহজেই লক্ষণীয়। একদিকে মৌলিক সাহিত্য লিখেছেন, অন্যদিকে অনুবাদ করেছেন এবং দুক্ষেত্রেই তিনি সংবেদী একজন লেখক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপনা করেছেন। তার দু-একটি ছোটগল্প আমার কাছে অসাধারণ মনে হয়েছে। তাকে কখনো বলিনি, কিন্তু প্রশ্নটি থেকেই যাবে—তিনি তার সৃষ্টিশীলতার এই অঞ্চলে কেন আরো মনোনিবেশ করেননি। আমাদের সাহিত্যে গভীরতার যে অভাব সম্প্রতি অনুভব করছি আমরা, তার অনেকটাই পূরণ হতো। তবে, তিনি যা দিয়েছেন, তারই বা বিকল্প কী?
তিনি বেঁচে থাকুন আরো অনেক দিন এবং আমাদের মনের চোখ উন্মীলিত করতে থাকুন, এই হোক এই লেখার শেষ প্রত্যাশা। তিনি আমাদের সময়ের এক বাতিওয়ালা, তার কাজ সহজে শেষ হবার নয়।

(সমাপ্ত)